দার্শনিক চেতনা ও কবি সুধীন্দ্রনাথ

ড. সুজয় কুমার মাইতি

অনুচিন্তন

আধুনিক কবিতার ইতিহাসে একাধিক কবি তাঁদের রচনায় সৃজনশীলতার প্রয়োজনে দার্শনিক চিন্তাকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কাব্যচিন্তায় প্রতিফলন ঘটিয়েছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণবাদী চেতনা, আত্মার সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা, মৃত্যু চেতনা প্রভৃতি। এই বিচিত্র ভাবনা তাঁকে এক অনন্য আত্মোপলোব্ধির কবি করে তুলেছে। বক্ষমান রচনাটিতে কবির এই জীবন দৃষ্টির দিকটিকে কাব্যের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ : সপ্তাশ্ব শকটে, উপজিল স্বপ্নলোক, সুরসুন্দরী, বিশ্বমানব, অসূর্যলোক, বিকীর্ণিয়া, নিধানভরা, নিত্যবহমান, আত্মোপমা, সূর্য অধোমুখ।

।। ১ ।।

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু এবং সুধীন্দ্রনাথ - এই পাঁচজন বিশ্বমনস্ক কবি তিরিশের দশকে রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাংলা কবিতায় মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের অভিনবত্ব এইখানেই যে, প্রস্তুতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ঋণ পরিগ্রহণ করেও সতর্কভাবে সন্ধান করেছেন নিজস্ব অবলোকনভঙ্গি ও উচ্চারণরীতি। তাঁর কবিতায় একাধারে আছে প্রবঞ্চনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের হাহাকার, অতীতের সুখস্মৃতিমন্থন, বিশ শতকের সমস্ত বিপর্যয়, সংকট, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, সভ্যতা-লাঞ্ছিত অসহায়তা ও বিচ্ছিন্নতা। আবার তাঁর মধ্যে রয়েছে এক দার্শনিক মনন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসা, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোলব্ধির নিরন্তর অনুসন্ধান। কেবল বক্তব্যে নয়, কাব্যাঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বকীয়তা সুচিহ্নিত। আমরা এখানে কেবল তাঁর কবিমনোলোকের দার্শনিক জীবনজিজ্ঞাসার দিকটিকে নানা কাব্যের সূত্রে তুলে ধরবো।

।। ২ ।।

সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিক-মানস সংগঠনের পশ্চাতে ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন অনুশীলন, অজস্র কাব্য-সাহিত্য পাঠের স্মৃতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈরীবিশ্বের প্রতিকূলতা এবং ব্যক্তিক জীবনের ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে অন্তরাশ্রয়ী দার্শনিক ভাবানুভূতিতে নিয়ে গেছে। অবশ্য তিনি জানেন, 'দার্শনিকতা কাব্যের উপকরণ না হয়েও কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ' ('রবিশস্য', 'কুলায় ও কালপুরুষ') কেননা তা পাঠক-হৃদয়ে যে জিজ্ঞাসা ও চিন্তার জন্ম দেয়, তার ফলে কবি কালান্তরেও নন্দিত হয়ে থাকেন। যেমন হয়েছেন টি.এস.এলিয়ট। সুধীন্দ্রনাথের

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর

ছিল কবিপ্রতিভার এই শ্রেষ্ঠ সম্পদে অধিকার। সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতায় যেমন তাঁর চিন্তা সমৃদ্ধ, তেমনি সচেতন অন্বেষায় ও বিচার-বিতর্কে তিনি হয়েছেন দার্শনিক মনোভাবের কবি। যেখানে নেই অমিয় চক্রবর্তীর মতো দার্শনিকতাঋদ্ধ সহজ অনুভূতির তাগিদ। অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় যেখানে আছে সৌরমন্ডলের রহস্য, মানবচিত্তের গভীরতা, জীবন-মৃত্যুর বিচিত্রলীলা, পৃথিবী-বিজ্ঞান সংলগ্ন বিস্ময়ানুভূতি; সেখানে সুধীন্দ্রনাথে রয়েছে সংশয়াত্মক তার্কিক-সুলভ সমাধান-অন্বেষণ।

।। ৩।।

।। ঈশ্বর সংক্রান্ত ভাবনা ও সুধীন্দ্রনাথ।।

সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বর বিষয়ক ভাবনার প্রথম পরিস্ফুটন পাওয়া যায় 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থে। দেবতার ইতিবাচক উচ্চারণের সঙ্গে এই কাব্যে রয়েছে দ্বিধা, সংশয় ও অভিমানজনিত নেতিবাচক উক্তি। কাব্যের 'অনাহূত' কবিতায় 'নশ্বর নরের ছদ্মবেশে' 'দেবতার' আবির্ভাবের উল্লেখ আছে, 'উর্বশী' এবং 'কবি' - এই দুটি কবিতায় আছে প্রত্যয়ী মনোভঙ্গির অভিব্যক্তি এবং 'চ্যুতকুসুম' কবিতায় আছে প্রচ্ছন্ন অভিমানবোধ —

"দেবতারা সব স্বরগবাসী;
তাদের চোখে সদাই দীপ্যমান
উ র্ব তরুর শুদ্ধ গরবরাশি,
পরদেশীর রঙীন অভিমান।'' ('চ্যুতকুসুম')

এবং এই একই কবিতায় কবি প্রেমিকার আসনকে দেবতার ঊর্ধে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"দেবতা লউন নিজের অর্ঘ্য বেছে,
তাঁরে আমার কিসের প্রয়োজন ?
যে লবে এই প্রেমের মালা যেচে,
তার তরে মোর ধন্য আয়োজন!''

'তন্বী' কাব্যের অস্ফুট উচ্চারণ উত্তরকালে সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যের 'পশ্চিমের ডাক' কবিতায় স্পষ্ট কবির সন্দিগ্ধচিত্ত, সন্ধ্যার পবিত্র প্রহরে সরল বিশ্বাসী যখন সায়াহ্নবন্দনায় সমবেত, কবি তখন দ্বিধাগ্রস্ত —

"বাহিরে নিঃসঙ্গ রাতে আমি শুধু মূর্তিখর্ব মনে
নিরাকার নির্গুণের করিতেছি সন্ধিগ্ধ অন্বেষ।'' (পশ্চিমের ডাক')

ঈশ্বরের আকার বা নিরাকার নিয়ে এখানে একটি প্রশ্ন কবি-মনে উঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু 'প্রতিহিংসা' কবিতায় বিশেষরূপে বহু ব্যবহৃত নঞর্থক শব্দমালা ব্যবহৃত হয়েছে ঈশ্বরের প্রসঙ্গে–'অলীক', অনাম কোন বিধাতার অলখ আসন।' 'হিমালয়' কবিতায় ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অনাস্থা দেখা গেছে:

"শ্বেত শুদ্ধ দেবতাত্মা ? সে তো শুধু পীত পুরাতন
পুরাণের আখ্যায়িকা, চিরাভ্যস্ত অপলাপ শত।'' ('হিমালয়')

তবে একথা সত্য যে, কবির ব্যক্তি-অনুভব ও অভিজ্ঞতার সমান্তরালে ঈশ্বরচেতনা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মূল সূত্রটি 'তন্বী' কাব্যেই কাব্যয়িত হয়েছে। প্রেম যখন পূর্ণ করেছে পৃথিবী, জীবন যখন সহনীয়, ঈশ্বর তখন অস্তিত্ববাচক ('বাৎসরিক', 'উর্বশী')। আবার অপরদিকে মানুষের ওপর তিনি যখন বিশ্বাসভ্রষ্ট, দেশ-কাল-সমাজ

যখন পঙ্কিল এবং বিপন্ন, নেতির আক্রমণে তখন বি বস্ত ও বিপর্যস্ত বিধাতা ('প্রতিহিংসা', 'হিমালয়')।

কবির প্রেমের কাব্য 'অর্কেস্ট্রা'। প্রেমের উত্থান-পতনে, প্রেমিকার আবেগ-অনাবেগে আন্দোলিত হয়েছে এখানে কবির ঈশ্বরভাবনা। এক সময় প্রেম যখন সঞ্চার করেছিল উজ্জীবনের প্রেরণা, তখন বিধাতা ছিল পরম আশীবাদী রূপ এবং সৃজন, মঙ্গল ও কল্যাণে সুষমামন্ডিত। কবি বলেছেন :

বিধাতা ছড়ায়েছিল স্পর্শমণি অম্বরে অম্বরে,
....
উৎকর্ণ চৈতন্য মম শুনেছিল সপ্তাশ্ব শকটে
সৃষ্টিধর করে সঞ্চরণ,
নব জীবনের বীজ ব্যোমের পরিধি–'পরে বুনি'। ('অনুষঙ্গ')

নিখিল নাস্তিপূর্ণ মহাশূন্য তখন শূন্য থাকে নি, মরণযন্ত্রণা জড়িত নির্বাপিত নয়নে এসেছে অতিন্দ্রিয় দৃষ্টি, নিরিক্ত নির্জন অন্তর তখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে আকাঙ্ক্ষার সহজ বিস্ময়ে। কিন্তু প্রেমিকার অন্তর্ধানে যখন শোণিত চাঞ্চল্য স্মৃতিতে পর্যবসিত তখন কবি অনুভব করছেন 'জন্ম-জন্মকার নির্বিকল্প প্রলয়ের ক্ষতি' এবং সেই ক্ষতিতে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর স্বর্গসহ অবলুপ্ত; —

"নন্দনের প্রতিশ্রুতি মম
ফণিমনসায় ঘেরা উপহাস্য মরুমায়া-সম।
তুমি সঙ্গে নাই,
বিপন্ন যাত্রীরে আজ ভগবান পাসরিল তাই।" ('অনুষঙ্গ')

আসলে কবি উপলব্দি করেছেন অমৃত কোন স্বতন্ত্র সৃষ্টি নয়, তা মর্ত্যেরই অবদান–'স্বল্পপ্রাণ প্রমোদের কণা'। ('অসুষঙ্গ') এবং সঞ্চয় করে জন্মান্ধ রচনা করে তার স্বপ্নলোক। তবে বিধাতার প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন অভিমানবোধ কবি-হৃদয়ে জাগ্রত। প্রেমিকা নেই, তাই ঈশ্বর তাঁকে বিস্মৃত হয়েছেন বলে কবি মনে করেন। আবার কখনো ঈশ্বরকে পরাজিত করে উচ্চারিত হয় প্রেমের বিজয়-দুন্দুভি; —

"জানি, জানি বিধাতা নির্দয়
কোনও দিন পারবে না অগর্লিতে সে-স্বর্গের দ্বারা,
ইন্দ্রত্বের ধ্রুব অধিকার
তোমার প্রেমের স্মৃতি রচিয়াছে মোর লাগি যেথা,
অয়ি মহাশ্বেতা"। ('মহাশ্বেতা')

এই মনোভাব আরো দৃঢ় ও প্রগাঢ় হয়েছে 'প্রলাপ' কবিতায়, যেখানে কাব্যরূপ লাভ করেছে নির্দয় বিধাতার কাছে কবির আবেগময় প্রার্থনা; —

"ছাড়িলাম অমৃতের দাবি;
ফিরে নাও প্রতিশ্রুতি নন্দনের দাবি।
....
কৈবল্যের পরিবর্তে কারা প্রত্যর্পণ

নশ্বর আশ্লেষে তার নিমেষের বিশ্ববিস্মরণ;
দিতে চাও, দাও, ভগবান,
সে-চপল চুম্বনের অখন্ড নির্বাণ;'' ('প্রলাপ')

এই মুহূর্তে প্রেমের স্বর্গ এবং ঈশ্বরের স্বর্গ পরস্পর বিনিময়যোগ্য। কিন্তু পরক্ষণে কবির মনে হয় 'অমরত্ব মিথ্যা কথা, মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞের বড়াই' ('প্রলাপ') মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতি, বংস এবং মৃত্যুই সত্য এবং এই সত্য সত্যতর করার প্রয়োজনে আহূত হন বংসের দেবতা —

''হানো, হে পিনাকী
হানো তবে তব বিষবাণ''। ('প্রলাপ')

'অর্কেস্ট্রা' কাব্যে 'উদ্‌ভ্রান্তি' অনুরূপ একটি কবিতা, যেখানে ঈশ্বর সম্পর্কে দোলাচলবৃত্তি স্পষ্টতর হয়েছে। দৈবখেয়ালে যখন সহস্য অভিন্ন ভিন্নদেশী প্রাণ, তখন

'নিরালম্ব শূন্যে আচম্বিতে
উপজিল স্বপ্নলোক'; ('উদ্‌ভ্রান্তি')

এবং কবিভাষ্য হল —

'চাহিলাম ঊ র্বমুখে
দেখিলাম অন্ধতম ঝলমল স্বর্গের কৌতুকে'; ('উদ্‌ভ্রান্তি')

কিন্তু প্রেমিকার বভ্রুকেশ যখন অদৃশ্য, বুদ্ধি তখন বৈনাশিক এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে তখন বিঘোষিত হয়ে যায় ফ্রয়েড—

''অর্মত্যের উপাদানে বিরচিল নয় সে-আবেশ;
অলকানন্দার আগমনী
শুনিনি সেদিন কানে; গর্জেছিল আমারই ধমণী
বাঁধ-ভাঙা বিরংসার আবিল বন্যায়; ('উদ্‌ভ্রান্তি')

মিলনের মোহমুগ্ধ প্রমোদ প্রহরে মানুষী স্নেহে আশ্রয় নেয় কবির অমরাবর্তী, তখন 'আসে তথাগতি তোমার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে' ('অর্কেস্ট্রা'), অথচ রূঢ় বাস্তব যখন মুখ ব্যাদান করে, কবি অবহিত হন প্রিয়ার ভুবনে তিনিই প্রথম আগন্তুক নন, তখন ভাগ্যরবি পাতালগামী হয়, চতুর্দিকে ঘনীভূত হয় অন্ধকার আর নাস্তির অভ্যুদয় অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ দ্বন্দ্ব-তাড়িত কবি। তাই তাঁর নষ্ট বিশ্বাসের হৃদয়ভূমি স্বর্গের ভস্মস্তূপের সঙ্গে তুলিত হয় এবং নিহত বিধাতা বা পলাতক অন্তর্যামীর জন্যে কবি কণ্ঠের হাহাকার অস্পষ্ট থাকে না —

''অতীতের পথ
অবলুপ্ত বিনষ্ট স্বর্গের বংসস্তূপে
চুপে চুপে
ছেড়ে গেছে অন্তর্যামী অরাজক অন্তর আমার;'' (বিস্মরণী')

প্রকৃতপক্ষে 'অর্কেস্ট্রা'র প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি প্রেম। আর সেই প্রেমের রাগ-বিরাগে গ্রথিত কবির বিশ্বাসের

ভূখন্ড, বিধাতা ও স্বর্গের অস্তিত্ব।

'ক্রন্দসী' কাব্যের ঈশ্বরবোধ কাব্যের স্বভাবগত ভিন্নধর্মিতায় প্রভাবিত। কবির ঈশ্বরভাবনা এখানে নির্মমভাবে বিদ্রূপবিদ্ধ, নাস্তিবোধে উচ্চকিত। তিনি জানেন, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে অন্বিত মানুষের ঈশ্বরজিজ্ঞাসা বিচিত্র ভাবমূর্তির রহস্য নেয়। সেই প্রাচীন প্রকৃতিনির্ভর মানুষ আজকের দিনে বিজ্ঞান-সচেতন আধুনিক হওয়ার ফলে ঈশ্বরের ওপর পূর্বের অবিচল আস্থায় সমর্পিত নয়। কিন্তু জীবনের চারিদিকে নানা কলুষের বেদনা প্রত্যক্ষ ক'রে কবি স্মরণ করেছেন ইহুদী ধর্মের সেই প্রাচীন ঈশ্বরকে, যিনি একদা পাপে মজ্জমান জনগণকে দিয়েছিলেন বংসদন্ড;

"ভগবান, ভগবান, য়িহুদির হিংস্র ভগবান,
ভুলেছে কি আজি দুঃশাসনে ?
ধেয়ে এসো রুদ্র রোষে, এসো উন্মত্ত হুংকারে'', ('প্রত্যাখান')

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার ঐশ্বরিক মন্ত্রে কবির আস্থা নেই। তিনি লক্ষ্য করেছেন দুর্বৃত্তের উজ্জীবন, নিরুপায়ের পরাজয়। আজ যারা শক্তির অহমিকায় সর্বগ্রাসী তারাই বিধাতার আশীর্বাদপুষ্ট, অপরদিকে পরাজিত-লাঞ্ছিতের সামনে তুলে ধরা হয় বৈকুণ্ঠের স্বপ্ন। কিন্তু —

'কোন্ ফল সে অমৃতে ?
পারিবে কি তাহা ফিরে দিতে
পৃথিবীর জলবায়ু রৌদ্র-ছায়া, সিদ্ধি ও সাধনা ?' ('প্রশ্ন')

তাই কবি ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয়ান্বিত। ভগবান কি কেবলই একটি শুন্যগর্ভনাম ? অরণ্যচারী নির্বোধ মানবকুলের ভ্রান্ত দুঃস্বপ্ন ? নাকি যাযাবর আর্যের বিধাতা আজ হৃৎশক্তি ? —

''আজিকে আর্তের কাছে পারিবে কি করিতে প্রমাণ
নও তুমি নাম মাত্র;
তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব, ন্যায়নিষ্ঠ তুমি ভগবান ?'' ('প্রশ্ন')

বিশ্বগত বেদনায় কবিহৃদয়ে এখানে যেমন স্পষ্ট তেমনি ঈশ্বরের জন্যও তাঁর অন্তঃশীল ক্রন্দন অস্পষ্ট নয়। কিন্তু 'প্রার্থনা' কবিতায় তাঁর ঈশ্বরের প্রতি বিক্ষোভ প্রচন্ড এবং তা অবিরল বিদ্রূপ বর্ষিত। এই কবিতায় তিনি ঈশ্বরকে কখনো সম্বোধন করেছেন 'অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা' বলে, কখনো 'অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান' কিংবা 'লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান' রূপে। কবিতার উপান্তে প্রতিশ্রুত স্বর্গের চিত্রাঙ্কনে ঝরে পড়েছে কবিহৃদয়ের তীব্র ক্ষোভ ও জ্বালা; —

"অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমি সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কার পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে,

শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে।'' ('প্রার্থনা')

'ক্রন্দসী' কাব্যের একাধিক কবিতায় কবি ঈশ্বরকে নানা বিশেষণে ভূষিত করেছেন। যেমন, 'সমুদার বিধি' ('অকৃতজ্ঞ'), 'ব্যর্থ ভগবান' ('প্রশ্ন'), 'কুটিল দেবতা' ('ভাগ্যগণনা'), 'অশ্রিত বিধি' ('সিনেমায়'), 'নির্বিকার নিরুত্তর, রুক্ষ বিধাতা' ('সমাপ্তি') ইত্যাদি। 'সন্ধান' কবিতায় চিত্রিত হয়েছে ঈশ্বরের রূপচিত্র: —

বারে বারে যার স্বপ্নসেনা
অলীক স্বর্গের দ্বারা হানা দিতে ছুটে
শূন্যের পরিখা-ঘেরা ব্রহ্মাণ্ডের সন্তপ্ত সম্পুটে
যেথা তার প্রতিনিধি, ক্রুর ভগবান,
পাসরি সম্রাটনিষ্ঠা অগোচর সামন্ত-সমান,
অনাদি নীরবে ব'সে, মনে গোপনে
চক্রান্তের ঊর্ণাজাল বোনে। ('সন্ধান')

সুবিপুল শূন্যতায় নিমগ্ন থেকে কবি যখন 'নিখিল নাস্তি'কে দেখেন তখন তিনি বিশ্ববিধাতার পরিবর্তে বিশ্বমানবকেই গ্রহণ করেন। যে অস্তিত্ব অলৌকিক বা অতিলৌকিক নয়, মানুষের উচ্চতর সত্তা যার অভিজ্ঞান, স্বর্গ বা ঈশ্বরকে যে প্রতিফলিত করে তোলে। তাই তো 'প্রতীক' কবিতায় কবিকে বলতে শুনি :

"তবু বিশ্বমানবেরে একমাত্র সত্য বলে জানি;
অতিমর্ত্য তারই স্বপ্ন, বিশ্বপতি কল্পপুত্র তার।''

এই 'বিশ্বমানবের' আমলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধন সংকীর্ণ সীমাতিরিক্ত বিশ্বমানব এবং যা শাশ্বত মানুষ। মানবতন্ত্রী সুধীন্দ্রনাথ সভ্যতার রক্তলাঞ্ছিত পটভূমিতে এই পূর্ণ মানুষকেই অন্বিষ্ট বলেই জেনেছেন।প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে 'বিশ্বমানব' অভিধাটি একটি ভাবনাশ্রয়ী। তিনি সেখানে বলেছেন:

"মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতিতে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব।"

সুধীন্দ্রনাথও তাঁর 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থের 'মনুষ্যধর্ম' প্রবন্ধে মহামানবের প্রতিভূ, এমনকি বিশ্বমানবকে মহামানব অপেক্ষা শ্রেয় বিবেচনা করে বলেছেন:

"মহৎ মানুষও মানুষ, অমানুষ বা অতিমানুষ নয়; এবং আমার পাশে তাকে যতই গগনস্পর্শী দেখাক না কেন, তার মনুষ্যত্ব সীমাবদ্ধ, যার জন্যে মানব সমষ্টির প্রতিযোগে তার পরাজয় অনিবার্য। আসলে মহামানব বিশ্বমানবের প্রতিভূ; এবং তার সঙ্গে আগ্নেয়গিরির তুলনা চলে। তাকে প্রণালী ক'রে যে-দীপ্তি, যে তেজ, যে-দাহ অতিভূমিতে ওঠে, সে সমস্তই মানুষের

অন্তভৌম গৌরবের কণা-মাত্র; এবং সেই প্রচ্ছন্ন ঐশ্বর্যের বাহক যদিও আমাদের নমস্য, তার প্রতিনিধিত্বে যে-অমেয় মুক্তির প্রেরণা আছে, সে-উন্মাদনায় মাত্রাবোধের উচ্ছেদ যদিও প্রায় অপ্রতিকার্য, অথচ এতাদৃশ দর্প কোনও মতে পোষণীয় নয় যে একজন মহামানব, এমনকি জগতের মহামানব সমবায়, বিশ্বমানবের চাইতে গরীয়ান।"

'উত্তর ফাল্গুনীতে উপনীত হয়ে সুধীন্দ্রনাথের এই বিশ্বমানবচেতনা সম্প্রসারিত হয় নি, বরং পূর্বজ ঈশ্বর-সংক্রান্ত

ধ্যানধারণার অনুবর্তন ঘটেছে। তার কারণ 'উত্তরফাল্গুনী'র ঈশ্বরচেতনাভুক্ত কবিতাগুলি 'ক্রন্দসী'র সমকালে রচিত এবং কাব্যটি প্রেমনির্ভর। মূলত ঈশ্বরকেন্দ্রিক যে ক্ষোভ, উত্তেজনা ও চেতনাগত পরিণতি আমরা 'ক্রন্দসী' কাব্যে দেখতে পাই, 'উত্তরফাল্গুনী'তে তা অনুপস্থিত। 'উত্তরফাল্গুনী'র ঈশ্বরচেতনা প্রেমচেতনার সূত্রে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

স্মৃতি রোমন্থিত প্রেম যখন মিলনের সুগন্ধে ধরাতলে প্লাবিত করে তখন কবি প্রিয়ার ক্ষীণতনুকায় দর্শন করেন অসীমের ব্যাপ্তি—

তবু যখন মধুফুলের বনে
জড়িয়ে ভুজে অদৃশ্য তার কায়া
অতল, কালো, ডাগর সে-নয়নে
দেখেছিলুম তারার প্রতিচ্ছায়া,
জেগেছিল তখন আচম্বিতে
ভূমার আভাস যুগল বিপরীতে,
চিনেছিলুম অবাক সমাধিতে
মহাবিদ্যা যে, সেই মহামায়া।
ফাঁক রাখেনি কোথাও ত্রিভুবনে
সাধারণীর সামান্য সে-কায়া। ('ডাক')

দেহচেতনার সেই তন্ময় মুহূর্তে অনন্তের আবির্ভাব সম্ভব মনে হয়। 'অমরার চাবি' ('দ্বন্দ্ব') তখন আর দূরবর্তী থাকে না। প্রিয়ার সমুখে তখন তিনি অনাবৃত করেন সকল জরা-জীর্ণতা-খন্ডতামুক্ত নন্দনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি —

"নিয়ে যাব যেথা নেই দেশ-কাল,
নেই ব্যাধি-জরা, ক্ষয়-জঞ্জাল,
সত্য যেখানে স্বপ্ন-সুষমা,
ভেদ নেই যেথা সীসায় হেমে।'' ('প্রতিদান')

প্রেমের গভীরে আরতির সঙ্গে ঈশ্বর তাঁর বিচিত্র রহস্য সহ দেদীপ্যমান —

"দাঁড়ায় আমার পাশে

তাকাও যখন তারাখচা মহাকাশে,
হয় না কি মনের বিধির আদিম চিত্রলেখা
বাখানে সহসা চিররহস্য, সনাতন দেয় দেখা ?'' ('প্রশ্ন')

কিন্তু এই প্রেম যখন বিমুখ ও বিপরীত, বিধাতা তখন 'উদাসীন' ('বিলয়')। আর তখনই চতুর্দিকে নাস্তির বিস্তার, বিবেক-অবিবেক সমান ও বিষাদগ্রস্ত কবির উপলব্ধি —

''নন্দনের বন্ধ দ্বারা, জানি,
যাবে না খুলে তোমার করাঘাতে;'' ('নিবুক্তি')

চল্লিশের দশকের বিশ্বগত বিপর্যয় সুধীন্দ্রনাথকে বিচলিত করেছে। 'সংবর্ত' কাব্যে কবির এই মানস-বিচলিত হওয়ার কাব্যিক রূপ পাওয়া যায়। দেশ-কালের বিপুল নৈরাজ্যে 'আর্তনাদ ছাড়া' 'নৈবেদ্যের যোগ্য কিছু' ('উজ্জীবন') কবি আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু নৈবেদ্য কাকে ? সেখানে তো অবিশ্বাস উচ্চকিত। তাই তিনি বলেন :

''তিলভান্ড সর্বনাশ অতিদৈব বিশ্বের দেউল
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি; কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল;
শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা।'' ('উপসংহার')

পৃথিবীবিস্তৃত আদিম নৈমিষারণ্যের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যখন মহাকাল সমাধিমগ্ন, একদিকে বিশাচি চমূর নিষ্কন্ক অগ্রগতি, অন্যদিকে নির্জিতের নিরুপায় কণ্ঠস্বর, ঐশী ক্ষমতা নিরুপণে তখন ব্যর্থ কবি। তাই তো বলেন :

''আখন্ডল
নিরর্থক নামমাত্র জরাগ্রস্ত সহস্রাক্ষে আর
পড়ে না নারকী কীট; কুলিশপ্রহার
কম্পিত হাতের দোষে নির্দোষের মুন্ডপাত করে।'' ('উজ্জীবন')

পবিত্র পরিশ্রুত ভূস্বর্গ সম্পর্কে প্রশ্ন তীব্র হয়। প্রার্থিত মহামানব যেমন অদৃশ্য, তেমনি সত্যসন্ধানীও আজ নিশ্চিহ্ন, কেবল প্রবলতর অমাচেতনা; —

''নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে
ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,
আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।'' ('উজ্জীবন')

'সংবর্ত' কাব্যের জাতক (১) কবিতায় বিশ্বব্যাপী সার্বিক অবক্ষয়ে বিধাতার অপমৃত্যু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে — 'অপমৃত ভগবান; অস্তাচলে রক্তাক্ত অঙ্গার;' 'জাতক (২) কবিতায় একই প্রতি বনি শোনা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন, বিধাতা স্বপ্নমাত্র, নিয়তি অন্ধ ও বিচারক্ষ মতাশূন্য। কবি যেন কখনো কখনো মনে করেন, ঈশ্বর হ'ল আলো-ছায়ার বিচিত্র লীলাখেলা। 'বিপ্রলাপ' কবিতায় বলেন, 'হয়তো ঈশ্বর নেই; স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ'। কিন্তু এই দ্বিধা ও বেদনা তিনি অতিক্রম করেছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতায় অহংদীপ্ত ঘোষণায়। 'সোহংবাদ' কবিতায়

তিনি বলেছেন —

"নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি বনিত;
বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দূরান্ত তারায়
উধাও মনের আগে; মাতারিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলাও যে-কর্মফল, তা আমরই বুভুক্ষাজনিত;"

উপনিষদের একটি শ্লোকে আছে:

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তমিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি।।

(শ্লোক ৪, ঈশ উপনিষদ, উপনিষদ অখন্ড সং, এপ্রিল ১৯৮০, অনু. ও সম্পা. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেষচন্দ্র ঘোষ, হরফ প্রকাশনি, অক্টোবর ১৯৮০) এই শ্লোকের আলোকে সুধীন্দ্রনাথ এখানে আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম, সেই আত্মা বা ব্রহ্ম যিনি গতিহীন হয়েও মন অপেক্ষা বেগবান। এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মাতারিশ্বা বা আকাশে বিচরণশিল বায়ু প্রাণধারণের যাবতীয় কৃত্য সম্পাদন করে। এক ব্রহ্ম যেমন সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, তেমনি ব্যক্ত আমি অগণিত আমির সমন্বয় অর্থাৎ ব্যক্তিমানব বিশ্বমানবমুখী। দার্শনিক পটে বিশ্বমানবিকতার এই উজ্জীবন 'সংবর্তে'র বিশ্বজাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্যবহ হয়ে উঠেছে।

'দশমী' কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে নিয়ে ভাবিত নন; জগৎ সংসারের অসহায়তায় ঈশ্বরের জন্য তীব্র ক্ষোভ এবং ঈশ্বরকে অক্ষম ও নিঃশক্তি জেনে তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস অপগত হয়েছে। 'নৌকাডুবি' কবিতায় বললেন, 'অনুত্তার্য নাস্তির কিনারা।' কিন্তু এই নাস্তিবোধ তাঁকে পূর্বের মতো বিক্ষুব্ধ করেনি, বরং অস্তিবাচক অভিলাষ অঙ্কুরিত পলাশের প্রার্থনায়:

"পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি ?
জানি কোনওদিন ফিরবে না ফাল্গুনী;
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে ?" ('প্রতীক্ষা')

প্রকৃতপক্ষে 'দশমী'তে এসে কবি আত্মসমর্পণ করেছেন চৈতন্যের মর্মমূলে এবং গভীর প্রজ্ঞা নিয়ে তিনি নিবিষ্ট হয়েছেন ব্যক্তিস্বরূপের অন্বেষায়। ঈশ্বরকে নিয়ে তিনি এখানে যেমন পূর্ববৎ প্রশ্নাকুল নন, তেমনি নাস্তিককে মেনে নিয়েই হয়েছেন অস্তির প্রান্তবর্তী। তবে একথা সত্য যে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত কবিতায় সুধীন্দ্রনাথের যে জিজ্ঞাসা, অবিশ্বাস, যন্ত্রণা ও দাহ তা একদিকে যেমন তাঁর নিরীশ্বর জড়বাদী মনোভাব প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের অবচেতন করে সত্য-সুন্দর-সনাতন ঈশ্বরের জন্যে তাঁর হৃদয়ের মর্ম তলের গভীর, গূঢ় আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব বসুর অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য:

"তিনি নিজেকে জড়বাদী বলে থাকলে, তাঁর কবিতা আমাদের
ব'লে দেয় যে, তাঁর তৃষ্ণা ছিলো সেই সনাতন অমৃতেরই জন্য।

।। ৪ ।।

বৌদ্ধদর্শন ও সুধীন্দ্রনাথের কবি-ভাবনা

রবীন্দ্রনাথের মতে, বুদ্ধদেব 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব'। বুদ্ধদেবের এই মানববাদ মানবতন্ত্রী সুধীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারে তাঁর নিজস্ব পঠন-পাঠন বা পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বৌদ্ধধর্মের ওপর লেখালেখি সূত্রে। তবে অবিমিশ্রভাবে তিনি বৌদ্ধদর্শনের চিন্তাচেতনাকে গ্রহণ করেননি। তিনি মুক্তচিন্তা ও ব্যক্তি-মানসিকতার আলোকে নির্মাণ ক'রে নিয়েছেন কবিচেতনার নিজস্ব যাত্রাপথ।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'শূন্য', 'শূন্যতা' ও 'শূন্যবাদ'-বাচক শব্দ ও বাক্যাংশের বহুযল ব্যবহার দেখা যায়। অচরিতার্থ প্রেম, বিরুদ্ধ সমাজ-পরিবেশ, ঈশ্বরের প্রতি অনাস্থা তাঁকে শূন্যবাদী দার্শনিক চেতনার সম্মুখীন করেছিল। বিভিন্ন কাব্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণযোগ্য :

ক) তন্বী:

i) "পরশে কি তোর, ইন্দ্রজালিক,
শূন্যে মিলাবে দানবী অলীক ?'' ('নবীন লেখনী')

ii) 'কী অধরা গাথা তার শূন্যে শূন্যে দেয় বিকীর্ণিয়া' ('পশ্চিমের ডাক')

iii) 'ছুটে গেনু তোমা পাশে-কোথা তুমি ? এশুধু শূন্যতা!' ('চিরন্তনী')

খ) অর্কেস্ট্রা :

i) 'অখণ্ড আননখানি সীমাশূন্য শূন্যে যে লুকালে।' ('বিকলতা')

ii) 'বিরহসন্তপ্ত এই শূন্যতা আমার।' ('প্রলাপ'

iii) 'মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু।' ('কস্মৈ দেবায়')

iv) 'সমস্বরে শূন্যবাদ দেখায় প্রমাণ।' ('উদ্‌ভ্রান্তি')

v) 'মনে হয়
অতল শূন্যের শেষে প'ড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়।' ('সর্বনাশ')

গ) ক্রন্দসী:

i) "পন্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া।
শূন্যতার কারা।'' ('নরক')

ii) "তাই জানি, ও দিব্য বরণ
নহে শাশ্বতের কান্তি; ও যে প্রাবরণ
নিরাশ্বাস, নিরর্থ শূন্যের।'' ('প্রতর্ক')

iii) "ছুটেছে গৈরিক পথ নির্বিকার সন্ন্যাসীর মতো
নির্গুণ, নির্বাণভরা, নিরাকার শূন্যের অন্বেষে'' ('পরাবর্ত')

ঘ) উত্তর ফাল্গুনী:

i) "হৃদয় তবু বিষাদে ভ'রে ওঠে
নিরুদ্দেশ শূন্যে যবে চাই;'' ('নিরুক্তি')

ii) 'কল্পনার কোষাগারে আজিকে যে এসেছে শূন্যতা।' ('অননুতপ্ত')

iii) 'বস্তুর দুর্দান্ত চিতা অনির্বাণ শূন্যের সৈকতে'; ('দ্বন্দ্ব')

ঙ) সংবর্ত:

i) 'শূন্য মনে ভূতে দেয় হানা;' ('জেসন')

ii) 'মুখে একবার তাকায়ে নির্নিমেষে,
শূন্যোদ্ভব দেব না দানব
আবার শূন্যে মেশে।' ('নান্দীমুখ')

iii) 'একান্তিক শূন্য তাকে করে বিশ্বম্বর'। ('সংবর্ত')

চ) দশমী:

i) 'শোধবোধ শূন্যে অবসিত'। ('অগ্রহায়ণ')

ii) 'বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধীরে ঝাড়ে'। ('নষ্টনীড়')

iii) 'মহাশূন্যে মাঠের হরিৎ' ('নৌকাডুবী')

লক্ষণীয় যে, 'তন্বী' থেকে 'দশমী' পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথের কাব্যমানস শূন্যচেতনাগ্রস্ত। কোথাও শূন্যবোধ হয়েছে অন্তর্বিশ্ব ও বহির্বিশ্বের বৈরিতায় হৃদয়ের বিপুল বেদনাভারবহ নঞর্থকতার প্রতিফলন, কোথও শুন্যবোধ হয়েছে বৌদ্ধ শূন্যবাদের স্পষ্ট বাহক, কোথাও শূন্যবোধ হয়েছে বিশালতার মহাশূন্যতায় উত্তীর্ণ, কোথাও শূন্যতাবোধ হয়েছে শূন্যতায় আক্রান্ত পারিপার্শ্বিক বিশ্ব, কোথাও মননজীবী কবির স্বীকৃতি-প্রাপ্ত যুক্তি-বুদ্ধির অতীত এক অজ্ঞাত জগৎ স্বরূপের বিবেচনা, কোথাও হয়েছে স্থির অনুধ্যানে সংস্থিত। 'পূরবী'তে জীবনসাবসানজনিত অসমাপ্তির বোধ রবীন্দ্র-হৃদয়ে রিক্ততা বা শূন্যতা জাগ্রত করেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'শূন্য' কখনও'ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ' ('পূর্ণতা', 'পূরবী'), কখনও সেখানে শূন্য 'জ্যোতির পথে ' বিসর্পিত। (ঐ) কিন্তু ইতিবাচক, অরূপ চেতনা নির্ভর রবীন্দ্র-মনোভাব সুধীন্দ্রনাথকে অধিগত করেনি। ফলে, তিনি ক্রমান্বয়ে শূন্যতাপীড়িত হয়েছেন। কেবলমাত্র, 'দশমী'তে একটি নিরাসক্তির ভাব বহমান। কারণ মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন এই কাব্যে কবিহৃদয় দেশ-কাল ও পাত্র সম্বন্ধে অন্যোন্যাবিরোধী মতামতের ঐক্যসাধনের প্রয়াসে নিয়োজিত।

বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের শূন্যচেতনার কতটাই সম্পর্ক। উপনিষদ বা বেদান্তমতে এক ব্রহ্ম থেকে সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই তার বিলয়। সেখানে বলা হয়েছে ব্রহ্মাই সত্য, জগৎ মিথ্যা। বুদ্ধদেব ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা পরাতত্ত্ব বিষয় নিরুত্তর থাকলেও জগতের অনিত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'সর্বম্ অনিত্যম্, সর্বম শূন্যম'। তাঁর মতে, দৃশ্যমান জগৎ বা প্রকৃতি প্রতিভাস মাত্র। আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের সংযোগসূত্রে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। এই সংযোগ বর্জিত হ'লে বহির্জগৎ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। আবার এই সংযোগও শাশ্বত নয়, প্রতিটি মুহূর্তে তার পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং জীবজগৎ কতকগুলো নিয়ত পরিবর্তনশীল 'ধর্ম' ও 'সংস্কারে'র প্রবাহমাত্র। এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি ড. রাধারমণ জানা রচিত 'পালি ভাষা-সাহিত্যে বোদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের 'বৌদ্ধদর্শনের ভিত্তি' প্রবন্ধের একাংশ:

> "প্রতিমুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের গ্রহণকে ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়, যে ধর্ম অনিত্য ও বিনাশশীল। এক মুহূর্তে যে ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে পরবর্তী মুহূর্তে তা বিনষ্ট

> হয়ে নূতন ধর্মের সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই বিভিন্ন ধর্মের সমীকরণে যে কল্পলোকের উদ্ভব তাকেই বলা হয় সংস্কার।"

এই অবিরাম পরিবর্তনশীল জগৎসংসারের অনিত্যতা বা শূন্যতা চেতনাগোচর করে। তা ছাড়া, বুদ্ধদেব নির্দেশিত সাধন-প্রণালী সম্যক সমাধিতে ধ্যানীচিত্তে নঞর্থক শূন্যভাব জাগ্রত হয়, তখন সর্বপ্রকার বস্তুজ্ঞান বা অহংবোধ বিলুপ্ত হয়। মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বৌদ্ধ-প্রসঙ্গ' রচনায় বলেছেন:

> "সম্যক সমাধিতে চিত্তের যে বিমুক্ত হয়, তাহার নাম অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্ত, আকিঞ্চন্য চিত্ত-বিমুক্তি এবং শূন্যতা চিত্ত-বিমুক্ত। সমাধির উচ্চ অবস্থায় কোনো বাহ্যবস্তু চিন্তার বিষয় হয় না, এইজন্য ইহা অনিমিত্ত (নিমিত্ত বিহীন)। তখন অন্তরে এই চিন্তা উপস্থিত হয় 'কিছুই নাই' 'কিছুই নাই'; এই জন্য ইহার নাম আকিঞ্চন্য (কিছুই নাই-এইভাব)। তখন আমিত্ব-জ্ঞান ও মমত্ব-বোধ বিদূরিত হয়, এইজন্য ইহার নাম শূন্যতা।" (বিশ্বভারতী, ১৩৬৩, পৃ.-৩৬)

বৌদ্ধদর্শনের উত্তকালীন বিকাশে মহাযান শাখার মাধ্যমিক সম্প্রদায় শূন্যবাদী নামে পরিচিত হয়েছেন। মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের মতে, অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা কোনটিই সত্য নয়, জগৎ যেমন আদি, মধ্য ও অন্তহীন, তেমনি পাপ-পুণ্য, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, সমস্তই শূন্যগর্ভ। মহাযানীরাও জগতের কারণ আদি বুদ্ধ বা পরমাত্মাকে শূন্যস্বরূপ বিবেচনা করেছেন এবং তাদের মতে নির্বাণও শূন্য। সুতরাং শূন্য থেকে জীব জগতের উৎপত্তি এবং শূন্যেই লয়।

বৌদ্ধদর্শনের এই শূন্যবাদকে পাশ্চাত্য পন্ডিত এবং প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা সর্বনাস্তিত্ববাদ-রূপে গণ্য করেছেন। শূন্য-বাদীরা ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করলেও অতীন্দ্রিয় সত্তাকে অস্বীকার করেছেন এবং এই অতীন্দ্রিয় সত্তার নাম শূন্যতা বা তথতা। শূন্য-স্বরূপ থেকে চ্যুতি জীবত্ব এবং শূন্য-স্বরূপে প্রত্যাবর্তনে নির্বাণ। আবার মহাযানপন্থীরা যেহেতু মৈত্রী ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, অতএব তা সর্বনাস্তিত্ববাদের সঙ্গে বিসদৃশ; সব কিছু নাস্তিবহ হ'লে ধর্মীয় আচরণ ও মৈত্রী ভাবনা নিরার্থক প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ-দর্শনের শূন্যতাকে অভাবাত্মক অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, বৌদ্ধ-দর্শনের নিখিলব্যাপ্ত প্রেম ও করুণা নঞর্থক হ'তে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাযুজ্যবহ হ'লেও সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে শূন্যবাদের এই অস্তিবাদী ধারণা তেমন প্রভাবশালী নয়। আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করতে পারি দীপক গুহরায়-এর রচিত 'মার্কস, সুধীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধদর্শন' রচনার একাংশ:

> "সুধীন্দ্রনাথের পিতাও বৌদ্ধদর্শনকে ক্রমাগত নাস্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থক অস্তিত্বে উত্তরণে বিশ্বাসী বলে মনে করেছেন। আধুনিক পুত্র অবশ্য এই অস্তিবাদী ও পরাশান্তিমূলক সিদ্ধান্তগুলিকে গ্রহণ করেন নি। জগৎ-ব্যাখ্যানে 'সর্বংক্ষণিকং', 'সর্বশূন্যং' প্রভৃতি নেতিবাচক বৌদ্ধ ধারণাগুলি সুধীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।"

একথা সত্য যে, কবির ব্যক্তিগত শূন্যতা যেমন বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণাবন্ধনে পূর্ণ হয় নি, তেমনি বিশ্বব্যাপী তান্ডবলীলায় তিনি বুদ্ধদেব বা রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের প্রেম ও ক্ষমার মহৎ ধর্মে আস্থা স্থাপন করতে পারেন

নি। তিনি মানবতাবতন্ত্রী, 'অন্বিষ্ট নির্বাণ আর সর্বদর্শী ক্ষমা' ('অনিকেত') তাঁর কণ্ঠেও অনুরণিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ক্ষয়, বিনষ্টি ও অবক্ষ য় তাঁর চেতনায় প্রবল ছায়া বিস্তার করেছে এবং তিনি নৈরাশ্যগ্রস্ত হয়েছেন। আবার ঈশ্বর-সংক্রান্ত দ্বন্দ্বাত্মক অনুভাবনায় তাঁর নেতিবাদী দৃষ্টিকোণ তাঁকে বৌদ্ধদর্শনের নিঃসীম শূন্যতার নিকটবর্তী করেছে। 'দশমী' কাব্যে তিনি যে ব্যক্তি-জীবনের ব্যর্থতাবোধ বা মৃত্যু চেতনাস্পৃষ্ট শূন্যতাকে উপলব্ধি করেছেন হীনযানীদের শূন্যবোধের সঙ্গে তার সাধর্ম রয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন,

"শোধবোধ শূন্যে অবমিত
নির্গত শ্বেদের সঙ্গে নিষ্পান্ত ক্ষ মতা।" ('অগ্রহায়ণ')

কিংবা —

"তারপরে মিশে আদিভূতে
হবে স্বাভাবিক।" ('নৌকাডুবি')

তখন এর মধ্যে হীনাযানী শূন্যতার ব্যঞ্জনা অনুভূত হয়ে যায়।

।। ৫ ।।

নির্বাণ চেতনা ও সুধীন্দ্রনাথের কবি-প্রত্যয়

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'নির্বাণ' শব্দের অজস্র ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই নির্বাণ চেতনা সকল তৃষ্ণার সমাপ্তিতে কখনও প্রেমানুভবের পরম সুখস্বরূপ, কখনও মৃত্যুর পটভূমিকায় মুক্ত-স্বরূপ। কিন্তু নির্বাণ মঙ্গলপ্রদ এবং অন্বিষ্ট বিবেচিত হলেও সুধীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে সংশয়মুক্ত হতে পারেন নি। জড়বাদী চেতনাসূত্রে কখনও তা কপোল-কল্পনারূপেও অনুভূত হয়েছে। যেমন, কয়েকটি উদ্ধৃতি –

ক) "হৃদয়ের মহাশূন্য কম্পমান নির্বাণের শীতে;" ('পুনর্জন্ম', 'অর্কেস্ট্রা')

খ) 'নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয়'। ('সৃষ্টিরহস্য', 'ক্রন্দসী')

গ) জুগুপ্সার শক্তি দাও, দাও মোরে নির্গুণ নির্বাণ।' ('প্রত্যাখ্যান,' 'ক্রন্দসী')

ঘ) 'সঞ্চিত গভীরে তব নিঃশ্রেয়স, নিবৃত্তি, নির্বাণ,।' ('জাগরণ', 'উত্তরফাল্গুনী')

ঙ) 'নির্বাণ সর্বতোভদ্রঃ'। ('প্রতিপদ', 'উত্তরফাল্গুনী')

বস্তুতপক্ষে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই লাভই হল সুধীন্দ্রনাথের কাম্য। মনোবিশ্ব ও বস্তুবিশ্ব যে বেদনা ও যন্ত্রণায় তাঁকে বিদ্ধ করেছে, তার থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্খায় বৌদ্ধদর্শনের নির্বাণ হয়েছে প্রার্থিত, যা সকল প্রকার আসক্তি থেকে মুক্তি ঘোষণা করে এবং যা 'নিঃশ্রেয়ম' বা সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণস্বরূপ। তাই তাঁকে বলতে হয় – 'দাও মোরে নির্গুণ নির্বাণ' কিংবা 'নির্বাণ সর্বতোভদ্রঃ'।

।। ৬ ।।

বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণবাদী চেতনা ও সুধীন্দ্রনাথ

বৌদ্ধ দর্শনে নিত্য-সত্য-শাশ্বত বলে কিছু নেই। দ্বিতীয় আর্যসত্য 'দুঃখ সমুদায়' বা দুঃখের উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণকালে বুদ্ধদেব 'প্রতীত্যসমুৎপদ' বা কার্য-কারণতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী জগতের সমস্ত কিছু কারণ ব্যতীত ঘটে না, সব কিছু পূর্ববর্তী কারণ থেকে জাত এবং বিনষ্ট হওয়ার পূর্বে কার্য রেখে যায়। বুদ্ধদেব বলেন, সবকিছুই অনিত্য এবং সবকিছুই ক্ষণিক। ইন্দ্রিয়সংযোগের মাধ্যমে পরিদৃশ্যমান

জগৎ আমাদের কাছে এক পরিবর্তনশীল প্রবাহমাত্র। বৌদ্ধদর্শনের এই অবিরাম পরিবর্তনবাদ গতিবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে গতির মাধ্যমে মুক্তিদ্রষ্টা, সুধীন্দ্রনাথ সেখানে অবিশ্রাম পরিবর্তনের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করেছেন।

'সংবর্ত' কাব্যের 'মুখবন্ধ' অংশ সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে-
> দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ,
> তখন না মেনে উপায় নেই যে আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী।"

এবং শেষতম কাব্য 'দশমী'তেও তাঁর উচ্চারণ —

> "আমি ক্ষণবাদী অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায়
> নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ , তথা
> তাতে যার জের, সে-সংসারও।'' ('উপস্থাপন')

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ বা বস্তুজগৎ নিমেষে তামাদী অর্থাৎ শেষ হয়ে যাওয়ার বেদনা অনুভূত হলেও এখানে আছে উন্মীলিত মৌহূর্তিক সত্যবোধ এবং ক্ষ ণমুহূর্তেই আছে ক্ষণবাদীর মুক্তি অন্বেষা। তাই তো কবি 'ভূমা' কবিতায় বলেন:

> "সে চির মুহূর্ত এই, বিশ্বরূপ যার ব্যক্ত মুখে,
> যার সারথ্যে ও সখ্যে ক্লৈব্য থেকে মুক্ত ক্ষণবাদী।''

এর সঙ্গে তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'শেষ সপ্তক' কাব্যের ৮ সংখ্যক কবিতায় উল্লিখিত নিম্নোক্ত অংশটি:

> "এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে
> আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল:
> তাঁর কাঁপনে আমার মন ঝল্‌মল্‌ করছে
> কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।
> অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
> সদ্যমুহূর্তের দান,
> এর সত্যে নেই কোনো সংশয়,
> কোনো বিরোধ।''

রবীন্দ্রনাথের এই মুহূর্তভাবনা হয়েছে তাঁর প্রসন্ন কবি-চিত্তের তন্ময়তায় অন্বিত।

সুধীন্দ্রনাথের ক্ষণকাল চিন্তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর একটি ব্যক্তিগত পত্রে। পত্রটি তিনি লিখেছেন ১৯৫৬ সালে অরুণকুমার সরকারকে, 'দশমী' নিয়ে কয়েকটি চিঠি। সেখানে তিনি বলেছেন:

> "আমি ক্ষণকাল বলতে যা বুঝি, তার সঙ্গে বের্গসঁ-এর 'সৃজনী পরিণতি'
> তুলনীয় নয়, তার উপমান হয়তো মাধ্যমিকদের দীপপরম্পরা। আমার
> কৈশোরে একদল পাশ্চাত্য দার্শনিক 'স্পীশস্‌ পেসেন্ট' নাম দিয়ে এক চির
> মুহূর্তের কল্পনা করতেন; এবং আমাদের চেতনা সেইরকম সর্বময় নিমেষে

> অহরহ আবদ্ধ। তাতে যা কিছু প্রত্যক্ষ, তাতো আছেই, যা দূর যা অনাগত,
> তা অতীত, তাও অন্তত ভাবচ্ছবিরূপে উপস্থিত।"

ফরাসী দার্শনিক হেনরী বার্গসঁ তাঁর 'Creative Evolution' বা একটি প্রাণশক্তির কল্পনা করেছেন যা শৈল্পিক 'বেগের আবেগে' জীবজগতের অভাবিতপূর্ব বিবর্তন সম্ভব করেছে। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মতো সেই সৃষ্টির বেগের আবেগের ওপর বা 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'র ওপর গুরুত্বারোপ করেন নি। তিনি বার্গসঁ-এর পরিবর্তে নিজের ক্ষণবাদকে সুস্পষ্ট করবার জন্যে বৌদ্ধদর্শনের দীপপরম্পরার শরণাপন্ন হয়েছেন। বার্গসঁ-এর প্রাণপ্রবাহ প্রতিনিয়ত নতুনের জন্ম দেয়। সেখানে পর্বতের বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। কিন্তু দীপপরম্পরার পরিবর্তন চোখে পড়ে না। যদিও পূর্ববর্তী শিখা পরবর্তী শিখা অপেক্ষা ভিন্ন। উভয় শিখা একই রকম বলে অভিন্ন মনে হয়। অর্থাৎ একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে, কিন্তু অভেদত্ব নেই। বস্তুর স্বরূপেই পরিবর্তন ঘটেছে। অনুরূপভাবে মুহূর্তের পর মুহূর্তে গ্রথিত জীবন, একটি মুহূর্ত এবং সন্নিহিত অপর মুহূর্তটি এক নয়, বিচ্ছিন্নভাবে তারা স্বনির্ভর এবং সর্বময়। এই ধারাবাহিকতার মধ্যে পার্থক্য অবলুপ্ত হলেও এই তাৎক্ষণিক মুহূর্তটি 'প্রতীয়মান বর্তমান' রূপে অনুভূত হয়। তার মধ্যেই অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং স্মৃতি ভাবচ্ছবিরূপে উপস্থিত হয়। মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ -এর (১৮৪২-১৯১০) 'স্পীশম্ প্রেসেন্ট' সূত্রের দিকে নজর দিয়ে থাকবেন, যেখানে জেমস্ বিশেষ স্থিতিকাল নির্দেশ করেছেন, যা বর্তমান হলেও একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের অংশ। এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি W.L.Reese -এর মন্তব্যটি:

> ``William James used the term ``specious present'' to refer to that span real duration which we are able to graps in a single act of awareness, although such a duration always contains also part of the future and part of the past."
> (W.L.Reese, Disctionary of Philosophy and Religion: Eastern : and Western Thought, Humenities, Press, 1980, New Jersy, P.-455)

এ ব্যাপারে ১৯৫৬ সালে অরুণকুমার সরকারকে লেখা চিঠিতে ('দশমী নিয়ে কয়েকট চিঠি') সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

> "বিজ্ঞানী বলেন যে, আমাদের অন্ত্রে ও নাড়িতে ধরা পড়ে ভূত থেকে ভবিষ্যতে উধাও কালের পদক্ষেপ। কিন্তু নিজের নাড়ি বা অন্ত্রের দোলকে কালমাত্রার পরিমাপ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, তথা ভূত প্রকৃতির মধ্যে গতির ও কালাতিপাতের সন্ধান পাই। উপরন্তু সে-সন্ধানের শেষেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুত সাক্ষ্য নেই, আছে বিমূর্ত প্রত্যয়, কিংবা ভাবচ্ছবি। তাহলে চিরমুহূর্তে আটকে থাকতে সোহংবাদীর আপত্তি কি ? এবং সে ভোলেই বা কেন যে সে ক্ষণস্থায়ী, তথা নাস্তিরই অংশভাক্।"

এখানে এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে ক্ষণবাদ ও নাস্তিবাদ দুই-ই। কবির বক্তব্য অনুযায়ী 'দশমী' কাব্য হয়েছে সোহংবাদ, ক্ষণবাদ ও নাস্তিবাদের ত্রিবেণী সঙ্গম। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি 'দশমী' কাব্যের প্রথম কবিতা 'প্রতীক্ষা'র

পর পর তিনটি পংক্তি:

"অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা।''

সুধীন্দ্রনাথের 'দশমী' কাব্যের সর্বত্র 'অধুনা' বা 'সম্প্রতি' বা 'বর্তমানে'র জয় বনি, যে বর্তমান কখনও নিছক বর্তমান। যেমন,

ক) "অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী;" ('প্রতীক্ষা')

খ) "একা সে এখন, বাঁধা অধুনার তালে;
ত্রিসীমায় নেই আদ্যন্তের দিশা,'' ('ভ্রষ্টতরী')

গ) "শুদ্ধ কৃতাঞ্জলি, বর্তমানের প্রত্যাদেশে দিন সঁপেছি।" ('প্রত্যুত্তরে')

আবার কখনও অতীত ও ভবিষ্যৎ-আশ্রয়ী বর্তমান অস্তিত্বের কথা বলেছেন কবি। যেমন,

ক) পরিপূর্ণ বর্তমান নাস্তি সুদ্ধ তার অংশভাক্;
ভূত অধুনার স্মৃতি, উপস্থিত স্বপ্ন ভবিষ্যৎ; ('ভূমা')

খ) "……শুনি
এবং ভাবি, অতীত তথা অনাগতের দাবি অস্বীকৃত
নয় অধুনায়; মানসসরোবরে বিম্বিত যে শ্যামল গিরি
এক সময়ে ছিল দেশান্তরে, বাদলে তার ধৌত মাটি
উপস্থিতের পলি; বনস্থলী উৎপাটিত সেখান থেকে,
কিন্তু এ-কর্দমে বিরাজমান নিত্য উপক্রমে; আছে,
তারাও সুপ্ত বীজের স্বপ্নে জেগে আছে, ('প্রত্যুত্তর')

গ) "……অধুনার্য্য
সাক্ষাৎ মাভৈ ঐকান্তিক বটে, কিন্তু বর্তমানে
দূর সরে আসে স্বত সন্নিকটে, ইতিহাস প্রাণ
পায় ভাবচ্ছবিরূপে।'' ('উপস্থাপন')

অবশ্য 'দশমী'র এই ক্ষণবাদী চিন্তাসূত্র কবি-চেতনার আকস্মিকতাজাত নয়। 'তন্বী' কাব্যগ্রন্থে এই মুহূর্ত চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, 'অন্ধকার' কবিতায় কবি বলেন:

"……পোতের পশ্চাতে ভেসে ভেসে,
প্রচণ্ড আবর্তাঘাতে লুপ্ত হয় নিমেষে নিমেষে
স্খলিত মুহূর্তগুলি, ক্ষণপ্রাণ বুদ্বুদের প্রায়,
তাহার অলক্ষ্য কেন্দ্র। চূর্ণ হয়ে, একত্রে মিশায়
অধুনার অহমিকা, আগামীর মোহন মহিমা,

অতীতের মুগ্ধ স্বপ্ন, সময়ের সুচিহ্নিত সীমা।''

কবির 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যে প্রেমের অনুষঙ্গে ক্ষণবাদী চেতনা কাব্যরূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'ক্ষণিকা' কাব্যে ক্ষণমুহূর্তের অস্তিত্বকে কৌতুকময় দৃষ্টিতে নিরীক্ষ ণ করেছেন, সেখানে সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা দার্শনিক প্রত্যয়ের গাম্ভীর্যে ও বিষাদে সুস্পষ্টতা পেয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষ ণিকা' কাব্যের 'উদ্‌বোধন' কবিতায় বলেছেন:

"যা আসে আসুক, যা হবার হোক,
যাহা আসে আসুক, যা হবার হোক,
গেয়ে ধেয়ে থাক দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিনী।
নিমেষে নিমেষে হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী।''

অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথের উচ্চারণ:

ক) "জানি মুগ্ধ মুহূর্তের অবশেষ নৈরাশে নিষ্ঠুর;" ('হৈমন্তী')

খ)"হিতবুদ্ধিহন্তারক ক্ষণিকের এ-আত্মবিস্মৃতি;" ('মহাসত্য')

গ) "ভুলিনি তো তুমি মুগ্ধ নিমেষের দান।" ('মহাসত্য')

ঘ) "আমি নিমেষের সখা, শুধু তবে চাঞ্চল্যের সাথী,
চলে যাব স্বল্পপ্রাণ নিদাঘের শেষে
নিরুদ্দেশ থেকে নিরুদ্দেশে।'' ('সঞ্চয়')

ঙ) "হে মোর ক্ষণিকা,
তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।
আগন্তুক শ্রাবণের বৈদ্যুতিক উল্লাসের মতো,
তীব্র প্রবর্তনা তব সাঙ্গ হোক সাশ্রু অন্ধকারে;''('মূর্তিপূজা')

।। ৭ ।।

।। আত্মা সম্পর্কিত চিন্তা ও সুধীন্দ্রনাথ ।।

অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিক দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত আত্মাকে স্বীকৃত দিয়েছেন এবং নিজেকে বা আত্মাকে জানার মাধ্যমে মুক্তি বা মোক্ষ লাভ সম্ভব বলে বিবেচনা করেছেন। বৌদ্ধদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত। সেখানে শাশ্বত আত্মার স্বীকৃতিকে সকল দুঃখের মূল বলা হয়েছে। হীনযান মতে আত্মা বা কারক বলে কিছু নেই, কর্মজগৎ আছে। চার্বাক মতেও স্বীকৃত নয়। বেদান্ত মতে ব্রহ্মই আত্মা এবং বিশ্বজগতের হেতু।

১৯৫৩ সালে সুধীন্দ্রনাথ 'সংবর্ত' কাব্যের 'মুখবন্ধে' আত্মা সম্পর্কে বলেছেন:

"বৌদ্ধদের মতো বৈনাশিক ব'লেই আমি যেমন কর্মে আস্থাবান, তেমনি
আমার বিবেচনায় স্বাবলম্বী কর্তা জগৎ-সংসারের মূলাধার।"

অর্থাৎ ব্যক্তিতন্ত্রী, অহংবাদী সুধীন্দ্রনাথ বৌদ্ধদর্শনের কর্মে আস্থাবান হলেও আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন নি।

তিনি তাঁর নানা কাব্যের একাধিক স্থানে 'আত্মা'র উল্লেখ করেছেন যথেষ্ট তাৎপর্যের দিক থেকে। যেমন:

ক) 'তন্বী' কাব্যের 'চিরন্তনী' কবিতার অংশ:

"হয়তো হিয়ার মোর স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
দেওয়ার আমোদে
আত্মারে নির্মুক্ত ক'রে, ভার হ'রে, হল অবসান
অযোগ্যের পদে;''

খ) অর্কেস্ট্রা:

i) 'আমার সংকীর্ণ আত্মা, লজ্জী আজ দর্শনের সীমা।' ('হৈমন্তী')

ii) 'ভয়ার্ত অশ্বের মতো, ছুটেছিল বিলুপ্তির পানে
আমার উন্মত্ত আত্মা মুমূর্ষার টানে।' ('উদ্‌ভ্রান্তি')

iii) 'কেন্দ্রস্থলে সংকুচিত আত্মার ধিক্কার।' ('উদ্‌ভ্রান্তি')

গ) ক্রন্দসী:

i) "যদিও আত্মার ঐক্য অসম্ভব সে-জড়জগতে", ('পারাবর্ত')

ii) "শরীর রহিল হেথা, সপ্ত সিন্ধু পলকে সন্তরে'
আত্মা বেগবান
অচেনা নগরীচূড়ে সংগোপনে করিল প্রায়াণ।।'' ('প্রতর্ক')

ঘ) উত্তরফাল্গুনী:

i) "আত্মা সদা স্বগত, একা বটে।" ('নিরুক্তি')

ii) "উলঙ্গ আত্মারে মোর চায় নিষ্পেষিতে।" ('অননুতপ্ত')

iii) "পেয়েছিল একদিন অসংবদ্ধ এই বংসস্তূপে
অমর আত্মার সাড়া;'' ('মৌনব্রত')

iv) "আজকে তবু আত্মা আমার একা;" ('ডাক')

ঙ) সংবর্ত:

i) "বলেছি আমি সে-আত্মা, যে উত্তীর্ণ দূরান্ত তারায়।'' ('সোহংবাদ')

কাব্য থেকে কাব্যন্তরে দেওয়া উহারণগুলিতে দেখা যায় যে, কবির কাছে আত্মা কখনও পীড়িত, কখনও বিপর্যস্ত, কখনও মুমুক্ষু , কখনও নিঃসঙ্গ, কখনও মৃত্যুহীন, কখনও সর্বব্যাপী। প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ আত্মা ও দেহ উভয়কেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই তো তাঁর উচ্চারণ - "সত্য কেবল দেহের দয়ায় মেলে।' ('ডাক') আবার তিনি চৈতন্যের অনুসন্ধানী হয়েছেন। মনে হয়, তিনি জড়বাদী ও ভাববাদী - এই উভয় চেতনায় পদচারণা করেছেন। এর মূলে আছে তাঁর দ্বন্দ্বাত্মক মানসচেতনা। সেই কারণে আত্মাকে অস্বীকার না করেও চলতে থাকে চৈতন্যের অনুসন্ধান। তাঁর সমগ্র কাব্যজুড়ে আত্মাসন্ধানের দিকটিও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়।

।। ৮ ।।

।। আত্মানুসন্ধানী কবি সুধীন্দ্রনাথ ।।

আত্মপরিচিত বা আত্মজ্ঞানলাভের বাসনা যে কোন স্পর্শজাগর চিন্তাশীল হৃদয়ে আলোড়ন জাগায়। সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বিবেকবিদ্ধ মননশীল কবি। অবিরল আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মানুসন্ধান তাঁকে পরিণামমুখী করে তুলেছে। কবির 'ক্রন্দসী' কাব্যের 'সন্ধান' কবিতাটি যেন হয়েছে কবির আত্মানুসন্ধানের চাবিকাঠিস্বরূপ। তিনি বলেছেন:

"আপনারে অহরহ খুঁজি।
কিন্তু যার স্পর্শ পাই, নিগূঢ় বিশ্রম্ভলাপ বুঝি,
অন্বিষ্ট সে নয়।''

কিংবা –

"অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাগে
বিকশিত আশুক্লান্ত নির্বিশেষ ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে।''

বটবৃক্ষের প্রতীকে কবি এখানে স্পর্শজাগর চৈতন্য নিরীক্ষ ণের প্রয়াস দেখিয়েছেন। চৈতন্য বা বোধি বা চিরসত্তার অন্বেষা হল 'নিজের অতলে' অর্থাৎ আত্মমুখী।

সুধীন্দ্রনাথ 'দশমী' কাব্যগ্রন্থের 'প্রতীক্ষা' কবিতায় যেন আত্ম-অন্বেষণের মধ্যে প্রশ্ন-এনেছেন এইভাবে –

"জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে;
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি ?''

'নৌকাডুবি' কবিতায় এসে তিনি যেন এই প্রশ্নের সমাধান পেলেন এবং বলে উঠলেন:

"তথাপি অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখা, তারপরে মিশে আদিভূতে,
হবে স্বাভাবিক।''

এই দুটি উদ্ধৃতি যেন সুধীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনকে কাব্যয়িত করে দিয়েছে। তিনি আদ্যন্ত প্রত্যয়-পীড়িত কবি। প্রেম, পৃথিবী বা দর্শনসঞ্জাত অনুভাবনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচিত্র চিন্তা ও অনুচিন্তায় বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন তিনি।বিচিত্র মতবাদে বিদ্ধ হ'তে হ'তে তিনি অবশেষে উপনীত হয়েছেন এই সিদ্ধান্তে যে, একমাত্র মৃত্যুর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্মোপলব্ধি সম্ভব। ১৯৫৬ সালে অরুণকুমার সরকারকে লিখিত 'দশমী নিয়ে কয়েকটি চিঠি'তে (পত্র-১) তিনি বলেছেন:

"আমার বিশ্বাস জীবন মরণে পূর্ণ এবং মৃত্যুর সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চেনে না।"

সুধীন্দ্রনাথের অন্তরপ্রদেশে ছিল এক 'বিবিক্তি' বা নৈঃসঙ্গবোধ। এর চূড়ান্ত প্রমাণ মেলে 'দশমী'র কয়েকটি কবিতায়। যেমন :

ক) "বিবিক্তি আজ বৈষ্টনীবিরহিত;" ('প্রতীক্ষা')

খ) 'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'। ('প্রতীক্ষা'

গ) "পায়ে-চলা পথে কে একাকী" ? ('নৌকাডুবি')

ঘ) 'নিরবলম্ব নিখিলে সে আজ একা।' ('ভ্রষ্ট-তরী')

কবির এই নিঃসঙ্গচেতনা হয়েছে তাঁর সমগ্র জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস স্বরূপ। কিন্তু এই নিঃসঙ্গবোধের উচ্চারণ ও উপলব্ধি সত্ত্বেও নষ্টনীড়ের স্মৃতি তাঁকে মথিত করে। 'দশমী'র শেষ কবিতা 'নষ্টনীড়', যেখানে প্রতীকী তাৎপর্যে কব্যায়িত হয়েছে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধযুক্ত পৃথিবীর প্রতি পরিণত শুকের আকর্ষণ–

"কৃষ্ণচূড়া নিষেধে মাথা নাড়ে
কুলায় খোঁজে শুক
চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ।''

সুধীন্দ্রনাথের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী –

"...The Krishnachura with its flowers of violent red and staring yellow is a symbol of physical life, while the parrot is the wounding self."

(অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাংশ, উদ্ধৃত,দীপ্তি ত্রিপাঠী,নষ্টনীড়, কবিতা-পরিচয়, পৃ.-১৫৭)

বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে,সূর্য হয়েছে অধোমুখী, শুক তার নীড়ে ফিরে যেতেচাইতে, কিন্তু কৃষ্ণচূড়া আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ। মনুষ্যজীবনের চরম অভিজ্ঞতা এখানে চিত্রকল্পাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। শুকরূপী মানবাত্মা কৃষ্ণচূড়ার উজ্জ্বল বর্ণাভায় বা পার্থিব জীবনের রূপে-রসে আকৃষ্ট হয়ে নীড় রচনা করে, কিন্তু সীমিত সময়ের অবসানে যখন ফুরিয়ে আসে জীবনের দীপ্তি, বনিত হয় মৃত্যুর নিঃশব্দ ব্যঞ্জনা, বস্তুপৃথিবী তখন বিরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। ব্যথাহত মানবাত্মার এই নিরাশ্রয় অসহায়তা হয়ে উঠেছে 'নষ্টনীড়' কবিতার মূল উপজীব্য। মনে হয় 'বিরূপ বিশ্বে' সুধীন্দ্রনাথের মানবাত্মা বা শুক হয়েছে আশ্রয়ভ্রষ্ট। মহাশূন্যেও এই শুকের আশ্রয় নেই। কারণ মহাশূন্য তার কাজ করে যাচ্ছে, ঝেড়ে ফেলেছে জীবন; অন্যদিকে কৃষ্ণচূড়া নিষেধাত্মক। সুতরাং শুকের ওড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তাই তো কবিকে লিখতে হয় —

"বিরত মহাশূন্য ওই গোধূলি ধারে ঝাড়ে;
কৃষ্ণচূড়া তাড়ায়, ওড়ে শুক।'' ('নষ্টনীড়')

'দশমী' কাব্যের নামকরণে, অন্তর্লগ্ন কবিতার আত্মায়, ব্যবহৃত শব্দ, শব্দানুষঙ্গ, ও চিত্রকল্পে যে সমাপ্তিবোধ বিজড়িত তার পশ্চাতে শুকরূপী 'দশমী'র কবির প্রচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান নিহিত; যা 'শোধবোধ শূন্যে অবস্থিত' ('অগ্রহায়ণ')। এই জাতীয় আত্মকথনে নির্দেশিত হয়ে যায় কবির জগৎ ও জীবনসম্পৃক্ত জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি। এ যেন কবির সত্যোপলব্ধির আত্মমুখী সৈকতে উপনীত হওয়া। কবি যখন 'নষ্টনীড়ে'র সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলেন 'স্বয়ংবর প্রথা' বা 'বিরহী শুক' কিংবা 'অনাত্মীয় অমা', তখনই কি সুধীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বনিত হয় না অমৃতত্বে উপনীত হওয়ার বৈদান্তিক প্রার্থনা ? হয়তো আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে জাগ্রত হবে কবির সেই ব্রহ্মজ্ঞান এবং সেখানেই তিনি হয়েছেন আদ্যন্ত আত্মসন্ধানী কবিপুরুষ।

।। ৯ ।।

।। মৃত্যুচেতনা ও সুধীন্দ্রনাথের মনোলোক ।।

১৯৩০ লেখা 'স্বগত' গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

"মৃত্যু যেহেতু জীবনের মূল তত্ত্ব, তাই তার প্রতি অবহেলা জীবনেরই অপমান।"

জীবন ও মৃত্যু পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য, মাধুর্য, বেদনা ও যন্ত্রণা যতটা বিকাশমুখী, মৃত্যু ততই গুঢ়, গোপন ও রহস্যময়। মৃত্যুকে অস্বীকার করে দিনাতিপাত করা যে কোন চেনতাসম্পন্ন মানুষের কাছে অসম্ভব। কারণ, জন্ম ও মৃত্যু বলয়িত জীবন এবং সেখানে মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু চিহ্নিত। বোদলেয়ার, রিলকে, হাইনে, মালার্মে, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রত্যেকেই চেতনাসম্পন্ন মনীষী। সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিকতাঋদ্ধ কবিহৃদয়েও মত্যুচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'তন্বী' কাব্যগ্রন্থে কবির মৃত্যুচেতনা হয়েছে জীবন-লাবণ্যের যবনিকাপাতের ঘোষণা স্বরূপ। মৃত্যু যেন কবির কাছে প্রতি বনিহীন শাশ্বত নীরবতার প্রতীক। তিনি 'তন্বী'তে বললেন, 'মরণের সাগরতলা' ('নিকষা'), 'মরণের মহামুক্তি' ('হিমালয়'), 'মরণের অধিক মরণ'('অন্তিম গীতিকা')। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মৃত্যুকে বলেছেন নবজীবনের প্রবেশদ্বার, বলেছেন 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' ('মরণ', 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'; সেখানে সুধীন্দ্রনাথের বিপরীত কথা বলেছেন:

"জীবন যৌবন কাম্য, প্রেম সুমধুর,
মরণ অজ্ঞাত অন্ধ অসুন্দর ক্রূর।'' ('অপলাপ')

কবির 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যে অচরিতার্থ প্রেমের পটভূমিতে মৃত্যু ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এই কাব্যে কবি মৃত্যুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি অনুভব করেছেন এবং বলেছেন:

"মোর কণ্ঠনালী
বদ্ধ যেন অগোচরে যূপে;
মৃত্যুর প্রবেশ পথ প্রতি রোমকূপে,
হৃদয়ের মহাশূন্য কম্পমান নির্বাণের শীতে;
নিখিল নাস্তিতে
মৌনের বিশ্রম্ভালাপ উপশয়ী বিভীষিকা-সনে;'' ('পুনর্জন্ম')

এখানে মৃত্যুচেতনা কোন নির্বাণ ভাবনাকে নিয়ে আসেনি, বরং স্পষ্টীকৃত হয়েছে মৃত্যুযন্ত্রণা-কাতর কবি-চিত্তের অসহায়তা। নৈরাশ্যপীড়িত কবির মৃত্যু হয়েছে 'রুদ্র মূর্তি পিপাসার জলে'র মতো, চরিযন্ত্রণার বিভীষিকা রূপ, কেবলই যাতনা। তাই তো 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় কবিকে বলতে শুনি:

"মৃত্যু, কেবল মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
যাতনা, শুধুই যাতনা সুচির সাথী।''

'ক্রন্দসী' কাব্যেও এই বোধের প্রকাশ দেখি। সেখানে তিনি বলেছেন:

"সে-নিগম সাধনায় হয়তো বা ঘটেছিল ত্রুটি;
মিলে নাই মোক্ষ ,শুধু ছিঁড়ে গেছে জীবনের ডোর।

সেই থেকে বেঁচে আছি মরণের গৈবী পায়ে লুটি;
আমারে ডরায় বেঁচে লোকে, জনসংঘ বিভীষিকা মোর।'' ('প্রতীক')

বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনপুষ্ট সুধীন্দ্রনাথ জানেন জীবন মায়া মাত্র; শূন্যতা এবং মৃত্যুই সত্য। আবার এই সত্যও তিনি জানেন যে, পৃথিবী একটি মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে না। পরিব্যাপ্ত জগতের প্রকৃতির সৌন্দর্য, পাখির কণ্ঠের কলকাকলি, জগতের, রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের আয়োজন চলতেই থাকে। কিন্তু কখনও গতায়ু প্রাণটির পুনরাগমন ঘটে না। তাই তো কবিকে 'ক্রন্দসী' কাব্যের 'ভাগ্যগণনা' কবিতায় বলতে শুনি:

"শুধু মোর দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ
সে-ডাকে দিবে না সাড়া।''

এর সঙ্গে জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' কাব্যের 'সেইদিন এই মাঠে' কবিতার বহুশ্রুত পংক্তিমালা:

"আমি চ'লে যাব ব'লে
চালতা ফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে।''

সুধীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু হয়ে ওঠে জীবন-ক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী শিকার:

"ক্ষ য়ের অক্ষয় বীজ মঞ্জরিয়া উঠে দুষ্ট ক্ষতে,
সৃষ্টির সুৎসিত স্ফীতি-রূপরেখা-'পরে।'' ('ভাগ্যগণনা')

সুধীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ দর্শনের নির্গুণ নির্বাণ বা চৈতন্যের সর্বাঙ্গীন মুক্তি কামনা করেন। এ মুক্তি সমষ্টির বাসনা-বেদনায় নয়, সর্বাত্মক বিনষ্টির মাধ্যমে অর্জন সম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস। 'ক্রন্দসী' কাব্যের 'মৃত্যু' কবিতায় 'সংকীর্ণ সংসারের নির্বোধ সংঘাতে' বিদীর্ণহৃদয় কবি মৃত্যুর ঘন অন্ধকারে উদার নির্বাণ-প্রার্থী, কিন্তু স্বপ্নবহ মলয়স্পর্শে অর্জিত অভিজ্ঞতা বড় নিদারুণ। কবি বলেছেন:

"মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ত্ব কল্পনামাত্র। বাল্মীকের সাম্যময় স্তূপে
নির্লিপ্ত, নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।

ব্যক্তিসত্তার মুক্তি দানে মৃত্যুও অক্ষম। কেননা, মৃত্যুর সঙ্গে গ্রথিত অতীত ও ভবিষ্যৎ। একদিকে 'প্রেতগণ/ জটলা পাকায় হেথা বৈতরণীতীরে; /অন্যদিকে 'জন্মান্তরের খেয়া ঘাটে ভিড়ে; / পরপারে কপিসেনা করে সেতুবন্ধের সূচনা।'

কবির 'উত্তরফাল্গুনী'তে মৃত্যু নানা সূত্রে প্রকাশমান। এই কাব্যের 'দুঃসময়' কবিতায় প্রেমিকার সহযোগিতায় কবি কখনো 'মৃত্যুর মাধুরী' দিয়ে স্বর্গ রচনায় প্রস্তুত, কখনো 'মৃত্যুর বিক্ষিপ্ত জাল' থেকে মুক্তিপ্রত্যাশী। আবার 'বিলয়' কবিতায় মৃত্যু সনাতন হিম ও ক্ষয়ে সংকেতিত হয়েছে :

"চিকন চিকুর তব হবে যবে তুষারধবল,
রজনীগন্ধার যষ্টি ওই ঋজু বরদেহখানি
তাকাবে ধূলার পানে, উবে যাবে রতিপরিমল;''

'উত্তরফাল্গুনী'র পর 'সংবর্তে'র বিশ্বব্যাপী তান্ডবের প্রেক্ষাপটে কবি আলাদাভাবে মৃত্যুভাবনায় আন্দোলিত

হয় নি। তিনি অনুভব করেছেন, এই আসন্ন প্রলয়ের কাছে 'মৃত্যুভয় নিতান্তই তুচ্ছ' ('উজ্জীবন'), 'বিয়োগান্ত ত্রিভুবন' ('বিপ্রলাপ') 'চৈতী ফসলে শটিত শবের স্বাদ' ('কাস্তে') এবং 'জন্ম-মৃত্যু অন্যোন্য বোধক' ('জাতক')। মৃত্যুর এই বিশাল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কবি কখনো ভেবেছেন, 'হয়তো অমৃত ব্যর্থ মৃত্যু বিনা' ('১৯৪৫')। কিন্তু পরক্ষণেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন :

"কিন্তু জীবন এতই বিকল কি যে
কেবল মরণে প্রমার সম্ভাবনা ?'' ('১৯৪৫')

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কবির মৃত্যুসংক্রান্ত প্রাথমিক বিষাদ পরবর্তীকালে দেশ-কাল-পৃথিবীর মাৎস্যন্যায়ে ব্যাপকভাবে ঘনীভূত হয়ে গেছে।

কবির শেষ কাব্য 'দশমী'তে মৃত্যুর প্রগাঢ় ছায়া কাব্যায়িত হতে দেখা যায়। 'দশমী' কাব্যে বর্ণিত পতনশীল অরণ্য, ক্ষওয়া মাটি, মজ্জামান তরণী, ভ্রষ্টতরী, হেমন্তের পড়ন্ত বেলা, ঐৌঞ্চপথের হিম ও রোদন, নষ্টনীড় প্রভৃতির মধ্যে কবির নৈরাশ্যগভীর মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন হৃদয়-ভাবনা উন্মীলিত হয়েছে। কাব্যের নামকরণেও সমাপ্তির সুর আভাসিত। 'দশমী' যদি রাধাবিরহের দশম দশা হয় অথবা বিসর্জনের বিজয়াদশমীর তাৎপর্য বহন করে, তাহলে তা মৃত্যুচেতনার ভাবকে অধিকতর ঘনীভবন করে নেয়। এই কাব্যের একাধিক কবিতার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায় সমাপ্তিবোধক বাক্য, শব্দ ও শব্দচিত্র। যেমন :

(ক) 'যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে। ('প্রতীক্ষা')

(খ) 'নির্ভার আবহে স্ফূর্ত অন্তর্ভম আমার সরিৎ
পৃথিবী ডোবায়।'' ('নৌকাডুবি')

(গ) 'তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক," ('নৌকাডুবি')

(ঘ) 'অন্ধ আলোর পলাতক পরমাণু
অমারাতে তাকে ছায়াপথে মিছে টানে।'' ('ভ্রষ্টতরী')

(ঙ) 'ফুরায় কলি আদিম অন্ধকারে' ('প্রত্যুত্তর')

(চ) "চৈত্রশেষ সূচিত হাড়ে হাড়ে,
সূর্য অধোমুখ।'' ('নষ্টনীড়')

এই উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে কাব্যায়িত হয়ে গেছে অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, বোধি বা প্রজ্ঞার বিচিত্র সূত্রে গ্রথিত কবির মৃত্যু চৈতন্য। এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের পত্রোক্তিটি দিয়ে আমরা উপসংহার করবো:

"....আমার বিশ্বাস জীবন মরণে পূর্ণ এবং মৃত্যুর সামনে না আসা পর্যন্ত ব্যক্তি আপনার স্বরূপ চেনে না। ...তবে উপলব্ধিটা বাস্তব — অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য গৃহীত নয়, বরঞ্চ এতবার এত রকমে ওটার কবলে পড়েছি যে ওকে আমার লেখা থেকে ছেঁটে ফেলা অসম্ভব।"

সহায়কগ্রন্থ:

১. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৬২, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ। [তন্বী (১৩৩৭), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৩৪৪), উত্তর ফাল্গুনী (১৩৪৭), সংবর্ত (১৩৬০), প্রতি বনি (১৩৬১), দশমী (১৩৬৩)] বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সং ১৯৭৬। পুন মু ১৯৮৪।

২. সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য গ্রন্থ
৩. স্বগত, ১৩৬৪, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, প্রথম সিগনেট সং।
৪. কুলায় ও কালপুরুষ, ১৩৬৪, কলকাতা : সিগনেট প্রেস, প্রথম সিগনেট সং।
৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১৩৯০, অমিয় দেব সম্পাদিত, কলকাতা : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ফাউণ্ডেশন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৬. অতুল চন্দ্র সেন, সতীনাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ অনূদিত ও সম্পাদিত, এপ্রিল ১৯৮০, উপনিষদ, অখণ্ড সং, কলকাতা : হরফ প্রকাশনী, পুন-মু অক্টোবর ১৯৮০।
৭. অরুণ সেন, ১৯৭৭, এই মৈত্রী। এই মনান্তর। কলকাতার পরকাশনী। ১৩৯০, বিষ্ণু দে : এ ব্রতযাত্রায়, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী।
৮. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, (প্র-প্র অনুল্লিখিত), আধুনিক কবিতার ইতিহাস, কলিকাতা: ভারত বুক এজেন্সি, নতুন পরিবর্তিত সং ১৯৮৩।
৯. অশ্রুকুমার সিকদার, ১৩৮১ আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনি, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বি-সং ১৩৮৬।
১০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮০, বাঙালীর, ধর্ম ও দর্শনচিন্তা, কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন।
১১. আবু সয়ীদ আইয়ুব, ১৯৬৮, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সং ১৯৭১।
১২. দীপ্তি ত্রীপাঠী, ১৩৬৫, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সং ১৩৮০।
১৩. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৮৭, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত: জীবন ও সাহীত্য, কলিকাতা: পুস্তক বিপণী।
১৪. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৯, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, কলিাকতা: প্রকাশভবন, দ্বি-সং ১৯৮১।